সংবাদ

তারিখ ...02.OCT..2015...
পৃষ্ঠা ..১৬... কলাম.....৫......

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন : লক্ষ্য মানোন্নয়ন

অমিত রায় চৌধুরী

বৈষম্যহীন মানসম্মত ও সর্বজনীন শিক্ষা বিতরণের অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করে। শিক্ষার্থীর মননে দেশপ্রেম জাগ্রত করে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একে একে নানা পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রচেষ্টা চলতে থাকে বিরামহীনভাবে। এর আগে দেশের শিক্ষা নিয়ে এমন নিবিড় আন্তরিক ভাবনা ও তৎপ্রসূত এমন সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞ পরিচালনার নজির বোধ করি ইতিহাসে বিরল। এখন বিচার্য বিষয় হলো শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের এত সব প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে বা লক্ষ্য অর্জনের পথটি সুগম ছিল কি-না কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় কি থাকিতে পারে-সেটি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যায়।

প্রথমেই দেখে নেয়া ভালো শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সরকার কী কী উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা। সর্বত্রই ব্যাপক সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা, পিএসসি, জেএসসি পরীক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষা মৌসুমের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া, প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় আনা, অনলাইনে ভর্তি, একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানো, সৃজনশীল পাঠ্যক্রম চালু করা, কোচিং বাণিজ্য বন্ধের আন্তরিক উদ্যোগ, ডিজিটাল কনটেন্ট এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ পাঠদান আকর্ষণীয় করা, নতুন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করতে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের ক্লাস শিডিউল নির্বিঘ্ন করতে প্রতি উপজেলায় একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা এমনকি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তকরণ ও একটি জাতীয় নীতিমালার আওতায় সারা দেশে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণ করার মতো মহাকর্মপরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে।

রূপকল্প বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন কষ্টসাধ্য ও বিভিন্ন সময় নানা বিতর্ক ও অন্তরায়ের সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এক্ষেত্রেও সেটি ঘটেছে। কারণগুলো অনুসন্ধান করে দেখা যাক। (১) শিক্ষার মান উন্নয়নে অন্যতম নিয়ামক শিক্ষক। কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতায় শিক্ষকের মেধা ও মান প্রশ্নাতীত নয়। বিভিন্ন কারণে দেশের সবচাইতে মেধাবী ছাত্রকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আকর্ষণ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ নীতিনির্ধারকগণের উদাসীনতা ও অবহেলা পরিস্থিতিকে বরং অবনতিশীল করেছে। সমাজ শিক্ষকদের জন্য ভালো বেতন, চাকরির উপযুক্ত পরিবেশ ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারেনি। (২) শুধু মেধা থাকলে শিক্ষক ভালো হবে এমনভাবে সরলীকরণ করাটাও যুক্তিসিদ্ধ হবে না। কেননা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত মেধাবী আমলা, চিকিৎসক কিংবা প্রকৌশলীবৃন্দ নিরঙ্কুশভাবে দেশপ্রেম ও সততা অক্ষুণ্ন রেখে দেশ সেবা করে চলেছেন- এমন কথা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি না। (৩) মূল্যবোধের সর্বাত্মক অবক্ষয়ে আক্রান্ত এ সমাজ থেকে শিক্ষকদের বাছাই প্রক্রিয়া যথেষ্ট প্রতিযোগিতাপূর্ণ, উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ না হওয়ায় 'নন-কমিটেড' শিক্ষকদের সংখ্যাই এখন দুঃখজনক হলেও বেশি। মেধার ঘাটতি থাকলে নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। কিন্তু আদর্শিক বিচ্যুতি মনোজগতে স্থায়ী রূপ নিলে তার সংশোধন প্রায় অসাধ্য। সর্বনিম্ন সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফার আকাঙ্ক্ষা যখন আর ১০টা পেশার মতোই শিক্ষককের কর্মপরিকল্পনার রোডম্যাপ তৈরি করে তখন শিক্ষকতার মতো মহান পেশা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সঙ্কুচিত হয় গোটা জাতির বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা। (৪) লক্ষণীয় যে, অনেক শিক্ষককে দেখেছি যারা লাইব্রেরি বিমুখ, প্রশিক্ষণে যেতে চান না কিন্তু উত্তরপত্র মূল্যায়নে আগ্রহী, শিক্ষক হয়ে ওঠার জন্য যে অন্তর্নিহিত তাড়নার দরকার, যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেটি লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। এজন্য শিক্ষক নির্বাচনে প্রার্থীর মনোজগতিক ঝোঁকটিকেও পরখ করে নেয়া দরকার। (৫) শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রতভাবে যুক্ত শিক্ষার্থীরা। তার মূল্যবোধ, চাহিদা, লক্ষ্য পরিবার ও পরিবেশ বেঁধে দেয়। সে তার বাইরে যেতে চায় না। দ্রুত স্কোর করে যে কোনভাবে সম্পদ গঠনের প্রতিযোগিতায় সে লিপ্ত হয়ে পড়ে। গ্রাম-শহর ভেদে অবশ্য চাহিদার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, লিঙ্গভেদেও কল্পনার গতিপথ পরিবর্তিত হয়।

এখানে যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো- পরিবার থেকে, সমাজ থেকে একটি শিশুকে কী শিক্ষা, কী নীতিবোধ দিয়ে আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাচ্ছি তার ওপর নির্ভর করবে তার প্রত্যাশার আদল, গতিপথ। সে যদি 'প্যাকেজ নোটস' সংগ্রহ করে অনায়াসে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায় করতে চায় আর তার অভিভাবক যদি হন তার নেপথ্য মদদ দাতা তবে ভালো শিক্ষকও আশাহত হবেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকগণ কোচিং ব্যবসা চালাতেই উৎসাহী হবেন। (৬) পরীক্ষার উত্তরপত্র যথার্থভাবে মূল্যায়ন এখনও কর্তৃপক্ষের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমি দেখেছি আমাদের প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ন্যায়ানুগ মূল্যায়ন করতে অনেক ক্ষেত্রেই পারছে না। সেটি কিছুটা পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ন্যায়ভ্রষ্টতা অথবা ব্যাপক ক্ষেত্রে তার উদাসীনতা, অবহেলা কিংবা দ্রুত মূল্যায়ন করে অন্য কোন লাভজনক কাজে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা অথবা শিক্ষা প্রশাসনের দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের প্রতিশ্রুতির কারণে। যুক্তি যাই হোক, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যে অনেকাংশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় তা নিশ্চিত ; যা অত্যন্ত অনভিপ্রেত ও দুর্ভাগ্যজনক। তাই যে কোন মূল্যে পরীক্ষার মূল্যায়ন অভিন্ন ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে একই উত্তরপত্র দুজন পৃথক পরীক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করানো এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত নম্বরের ব্যবধান ১০ (দশ) এর বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষককে দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন পরীক্ষকের গাফিলতি প্রমাণ হলে তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। ফলাফল প্রকাশের জন্য সময় ও আনুসঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় স্বার্থে এটা জরুরি বলে আমি মনে করি। (৭) পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আরও স্বচ্ছ, আধুনিক ও গতিশীল করার প্রশ্ন এখন ক্রমশঃ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিককালে পৌনপুনিক প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা কিংবা গুজব, বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন, এর অভিঘাত শিক্ষার্থীর মননে সুদূরপ্রসারী ও অমোচনীয় প্রভাব ফেলেছে। তাই এর পিছনে কোন গোষ্ঠী বা সিন্ডিকেটের পরিকল্পিত অপতৎপরতা আছে কি-না তা খতিয়ে দেখে যে কোন মূল্যে এ প্রবণতাকে রুখে দিতে হবে।

শিক্ষার মান নিয়ে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা বা উদ্বিগ্ন হওয়ার সংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। ব্যবস্থাপনার সব অংশগুলি সঠিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকলে নিজস্ব গতিতে শিক্ষার মান এগুতে থাকবে, যেমনটি এগুচ্ছে। কিন্তু মান বৃদ্ধি দৃশ্যমান রাখার জন্য একধরণের প্রতিযোগিতা পক্ষান্তরে শিক্ষার মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কি-না তা ভেবে দেখার প্রয়োজন। বিদ্যমান বাস্তবতায় শিক্ষার মৌলিক মানোন্নয়ন ও শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌছে দেয়ার জন্য সরকারের অধিকাংশ পদক্ষেপের মধ্যে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করি। অস্বীকার করার উপায় নেই প্রান্তিক জনপদের শিক্ষার্থী বিশেষ করে নারী শিশুদের ব্যাপক হারে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ আমাকে আশাবাদী করেছে। সেক্ষেত্রে এদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে চলমান কিছু পদক্ষেপের পাশাপাশি আরও কিছু প্রণোদনাদায়ী উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে আমি মনে করি।

তবে প্রযুক্তি ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষার্থীরা এখনও শহর থেকে পিছনে। গ্রাম ও শহরের মাঝে বিদ্যমান এই বৈষম্য নিরসনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। আর তা না হলে প্রযুক্তি বিস্তারে বাংলাদেশে যে নীরব বিপ্লব চলমান তাতে ছন্দ পতন ঘটতে পারে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান আকর্ষণীয় করার কোন বিকল্প নেই। ডিজিটাল কনটেন্ট এর মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদান এক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ও উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। ক্লাস শেষে সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রতিবেদন প্রেরণ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। শিক্ষকের সৃজনশীল পাঠ্যক্রমের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ শিক্ষককে সঠিকভাবে প্রস্তুত করে তুলবে। গাইড বই কিংবা কোচিং সেন্টার নির্ভরতা আপনা আপনি কমে আসবে। শিক্ষক শিক্ষার্থী যখন সৃজনশীল পাঠ্যক্রমের সংগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একাকার হয়ে যাবেন, শ্রেণিকক্ষ পাঠদান প্রক্রিয়া আনন্দময় ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। তবে এসব কর্মকাণ্ড নির্ভর করবে কার্যকর তদারকি প্রক্রিয়ার ওপর। 'পিয়ার ইন্সপেকশন' এর ধারণাটি খুবই আধুনিক, কার্যকর ও সময়োপযোগী। আমি দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করি প্রতিবছর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এমন পরিদর্শন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় স্থবিরতা দূর হবে, দুর্নীতি কমে আসবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠবে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির কারিগর আর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই তারুণ্যাশ্রিত জনশক্তিই হবে এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অনুঘটক; পরিবর্তনের রূপকার।

[লেখক : অধ্যক্ষ,
ফকিরহাট ফজিলাতুন্নেছা মুজিব
মহিলা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়]